রবীন্দ্রনাথের ইয়ার্কার
বনাম
অভিজিত রায়ের অনড্রাইভ

-বিপ্লব পাল

১৯৮৬-৮৯ সালের কথা। ভারত পাকিস্থানের খেলা মনে পড়লে, প্রথমেই যে দৃশ্যটা ভেসে ওঠে- কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ডানে বামে ব্যাট চালাচ্ছেন, কিন্তু ওয়াসিম আক্রামের ছটা বল ছয় রকম! শ্রীকান্ত গ্যালারীর দিকে তাকিয়ে ব্যাট করতেন এবং আক্রামের খুব কম বলই তার ব্যাটে বলে হত। শেষ বলে ইয়ার্ক এবং প্যাভেলিয়ানের দিকে শ্রীকান্তের হন্টন!

আক্রাম ছিলেন বিশুদ্ধ বোলিং শিল্পী-শুধু বোলার নন। পাকিস্থানের অতিসংকটময় মূহূর্তেও আউটসুইং করাতে গিয়ে দুই তিন ওয়াইড দিতেন। তার দায়বদ্ধতা ছিল সৃজনশীল বোলিং এর প্রতি-পাকিস্থান বা গ্যালারীর সুন্দরী রমণীকুলের প্রতি নয়। অন্যদিকে শ্রীকান্ত ছিলেন গ্যালারী ব্যাটসম্যান। একটা চার মারলেন-প্রচন্ড হাততালি। পরের বলটা কি হল খেয়াল না করে, আবার ব্যাট চালাতেন!

হুমায়ুন আজাদ বা অভিজিত রায়ের নারীবাদী লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, উনারা শ্রীকান্তের মতন ব্যাটসম্যান-রবীন্দ্রনাথের নারীবাদী ইয়ার্কার গুলিকে, নারীবিদ্বেশী ফুলটস ভেবে অনড্রাইভ মারছেন। ব্যাটে বলে হচ্ছে না এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উনারা ক্লীন বোলড!

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা করার প্রথম শর্তই হচ্ছে, তার 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধগুচ্ছ প্রথম থেকে শেষ শব্দ পড়ে ফেলা। সেটা পড়লেই অভিজিত বুঝতে পারত, সাহিত্যিকের সাথে সমাজবিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী, প্রতিবাদী ইত্যাদির পার্থক্য কি! যে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজের শোষন এবং অবিচারকে তুলে ধরে, সমাজকে পরিবর্তন করতে ডাক দেওয়া হয়, তাকে সোস্যাল কনস্ট্রাকসনিজম বলে। সাহিত্যের পথে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তিনি এই ধরনের সাহিত্য লেখেন না-তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যের পথিক। যার কাজ সাহিত্যকে সমাজের দর্পন হিসাবে দেখা। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সেই আইনায় ধরা পরবে। উক্ত প্রবন্ধে, উনি একথা স্পস্ট করেই বলেছিলেন যে কালিদাস যদি তৎকালীন কৃষককুলের জন্য লিফলেট লিখতেন, তাহলে আমরা সমাজ সংস্কারক কালিদাসকে পেতাম- মহাকবি কালিদাসকে নয়।

নারীবাদী সমালোচনা অনেক দৃস্টীকোন থেকেই করা যায়- অভিজিত যেটা করছেন, সেটা সমাজ গঠনমূলক দৃস্টিভংগী থেকে। এছারাও পোস্ট মডার্ন, ফ্রয়েডীয়, জৈবিক বিবর্তনবাদ, মার্ক্সীয় ইত্যাদি নানান দর্শনের আলোকেই একিই সৃস্টিকে দেখা যেতে পারে। তবে ধারাবাহিকতা থাকা উচিত। রবীন্দ্রনাথকে দেখব তাঁর প্রবন্ধ দিয়ে, আর শরৎবাবুকে দেখব তার একটি মাত্র

উপন্যাস দিয়ে !(কারণ তার লেখা 'নারীর মূল্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, নারীবাদের সবচেয়ে বলিষ্ট প্রবন্ধ)।

যাইহোক রবীন্দ্রনাথ নিজে যা দাবী করেন নি, তার কাছা ধরে টেনে তিনি তাই নন বলার মানে হয় না। আর আলোচনাটাও সাহিত্য নিয়ে, তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীবাদের মধ্যেই আমি সীমাবদ্ধ থাকব। সেটাও বলা বোধ হয় ঠিক নয়, সমগ্র সাহিত্য আলোচনা করার সময় বা জ্ঞান কোনটাই আমার নেই। আমি শুধু অভিজিত রায় এবং হুমায়ুন আজাদের একটি বিশেষ দাবী যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের ব্যাপারে ভিকটোরিয়ান-ব্যকডেটেড দৃস্টিভংগী নিয়ে চলতেন, এবং সেভাবেই লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আমি এখানে ছটি গল্প উল্লেখ করছি, যার প্রতিটি গল্পের নায়িকারাই ভিক্টোরিয়ান পুরুষতন্ত্রের উপর সজোরে থাপ্পর মেরেছেন।

নস্টনীড়,ল্যাবরেটরী,রবিবার,নামঞ্জুর গল্প, অধ্যাপক এবং স্ত্রীর পত্র।

প্রতিটি নায়িকা বিশ্লেষনের সময় নেই, আমি শুধু নস্টনীড়ের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। এই গল্পের চলচিত্রায়ন- সত্যজিতের 'চারুলতা'। সবাই দেখেছেন, তাই আলোচনা করা সোজা হবে।

নস্টনীড় গল্পটি অসাধারণ। শেষ লাইনটি বাদ দিলে, এটি আদ্যপান্ত বৈষ্ণবীয় পরকীয়া। শেষের একটি মাত্র লাইনের জন্য (চারু বলিল ' না, থাক') পুরো গল্পটি সমকালীন ভিক্টোরিয়ান পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রেষ্টতম প্রতিবাদ।

এই গল্পে, চারুর স্বামী ভূপতি ব্যর্থ পত্রিকার ব্যর্থ সম্পাদক। ভূপতি সমকালীন ভিক্টোরিয়ান পুরুষতন্ত্রের ধারক। তার স্ত্রী সম্মন্ধে ধারণাগুলি তুলে দিলামঃ

' গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্ষ না করে, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃস্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য এবং মহত্ব আছে।'

' সে কেবল আমোদ করিতেই জানে, ভালোবাসিতে পারে না? মেয়ে মানুষের পক্ষে এমন নিরাসক্ত ভাব তো ভালো নয়'

ভিক্টোরিয়ান পুরুষতান্ত্রিক ভাবনার অনেক উদাহরণ মণি মানিক্যের মতন ভূপতি ছরিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, চারু তার স্বামীর এই ভিক্টোরীয় প্রেমকে, নারীর স্বাভাবিক প্রেম ধর্মের পরিপন্থী মনে করে প্রত্যাখান করেছেন, এবং দেওর অমলের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছেন।

চারুর প্রেমের বিবর্তন একান্তই বৈষ্ণবীয়। প্রেমের মিলন পর্বে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যপ্রেমীরা যখন চারুর সাহিত্যকে, অমলের অপেক্ষা বেশী আমল দিচ্ছেন, চারু খুশী হতে পারছে না-'*প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল*'। অন্যদিকে অমলের পুরুষ অহংবোধে আঘাত লাগে এবং সে কাল মাত্র বিলম্ব না করে, চারুকে ডাম্প করে, মন্দার কাছে পুরুষ অহংবোধের আস্বাধন করে। অর্থাৎ পুরুষের কাছে তার অহংবোধ, প্রেমের চেয়েও বড়! যেন নারীকে তার দরকার অহংবোধের সৃজনে! সেখানে নারী, প্রেমে খোঁজে আত্মহুতি! পুরুষ নারী যেরকম, রবীন্দ্রনাথের দ র্পন সেটাই দেখাচ্ছে।

চারু-অমল প্রেমের শেষ পর্বে বৈষ্ণবীয় ভাব সম্মেলন। অর্থাৎ বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে, সে পাশে আছে ধ্যান জ্ঞান করে, মনসিজ মিলন (*উপুর হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বার করিয়া বলিত 'অমল, অমল, অমল!' সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত ' বোঠান, কী বোঠান'*)। বিরহ জ্বালায় পুরুষ প্রেমের নিষ্ঠুরতা চারু বোঝে বটে (অমলের শরীর ভালো আছে তবু সে চিঠি লেখে না!)।

তবে সেটাই গল্প না, গল্পের ক্যানভাস মাত্র!

গল্পের শেষ দৃশ্যে, ভূপতি মৈশুরে সম্পাদনার কাজে যাচ্ছে। স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম আবিস্কার করার পর, সে বিধ্বস্ত! তাই ইচ্ছা এই যে, প্রবাসে গিয়ে, স্ত্রীর থেকে দূরে গিয়ে, মনকে শান্ত করবে।

চারুও সঙ্গে যেতে চাইল।

ভূপতি ভাবল, এও নারীর আরেক ছলনা। আসলে প্রেমদাহিত এই গৃহ থেকে সে মুক্তি পেতে চাইছে। তাই ভূপতি প্রত্যাখান করে, চারুর অনুরোধ।

'*মূহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মতো শুস্ক সাদা হইয়া গেল, চারু মুঠো করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল*'।

এবার ভিক্টোরীয় পুরুষ যে ভাবে নারীদের নিয়ে ভাবেন, ভূপতিও তাই ভাবলেন! অর্থাৎ নারী মানসিক দিক দিয়ে দূর্বল, তাই তাকে করুণা করা দরকার। তাতেই বাড়বে স্ত্রীর প্রেম!

তৎক্ষনাৎ *ভূপতি কহিল, 'চলো, চারু, আমার সঙ্গেই চলো'*।

চারু বলিল 'না, থাক'।

অর্থাৎ , হে ভিক্টোরীয় পুরুষ, তোমার করুণায় আমার প্রেমের জল সিঞ্চন হয় না। তাই এই প্রত্যাখান।

এটাই রবীন্দ্রনাথের নারীবাদী ইয়ার্কার। বলটা আসে ফুলটসের মতন, দেড়ফুট আগে থেকে বেঁকে ব্যাট-প্যাডের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যায়।

হুমায়ন আজাদ, অভিজিত রায়রা, নারীপ্রেমে মোহিত হয়ে যদি এটাকে ফুলটস ভেবে অনড্রাইভে খেলতে যান, ক্লীন বোলড হবেন!

আক্রামের মতন বোলারদের খেলতে পারেন শচীনের মতন সমপ্রতিভাবানরা (রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ট সমালোচক অবশই ইয়েটস, যিনি নিজেও নোবেল লরিয়েট) বা দ্রাবিড়ের মতন নিষ্টাবান ব্যাটসমানরা (যেমন ধরুন অমিয় চক্রবর্ত্তী)। গ্যালারীর নারী মনোরঞ্জনের জন্য, চার ছয় মারতে গেলে, প্রতিপদে ক্লীন বোলড হওয়ার সম্ভবনা!

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে গেলে হিন্দু দর্শন (সেটা ভুল, ঠিক যাই হোক) বুঝতে হবে। অভিজিত এবং হুমায়ুন আজাদের রবীন্দ্রনাথভাস্যে সেই অভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।